‘স্বার্থপর জিন’ -এর আলোকে সহযোগিতা এবং আত্মত্যাগ
দিগন্ত সরকার

স্বার্থপর জিন*

বাংলাভাষায় একটা কথা আছে - "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী"। আমার ধারণা ডারউইনের "যোগ্যতমের উদ্বর্তন" নিয়েও এরকমই কিছু ভয়ঙ্করী ভুল ধারণা রয়েছে - তাদের মধ্যে একটি হল আগ্রাসী মনোভাবের ব্যাখ্যা। খুব সহজ চিন্তাভাবনা করলে মনে হবে যে যদি যোগ্যতমই সবসময় নির্বাচিত হবে তাহলে সব জীবই তো চাইবে অন্যেকে মেরে ফেলতে আর নিজের বংশবিস্তার করতে। তাহলে সেই প্রাণীদেরই আমাদের এখন চারপাশে দেখতে পাওয়ার কথা যারা হিংস্র, শক্তিশালী ও আগ্রাসী। একটি জীবকে যদি জিনসমষ্টি নিয়ন্ত্রিত একটি স্বার্থপর যন্ত্র (যাকে আমরা বলব সজীব যন্ত্র) বলে মনে করা যায়, তবে সেই জিনগুলোই বেঁচে থাকার কথা, যারা প্রাণীদের মধ্যে এই আগ্রাসী নীতি অবলম্বনে প্রলুব্ধ করে। কিন্তু বাস্তবে আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার ব্যতিক্রম দেখি, কেন?

ব্যাপারটা একটু বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা যাক। একটি সজীব যন্ত্রের কাছে বাকী জীব বা সজীব যন্ত্রেরা হল জল, কাঠ বা পাথরের মত প্রকৃতির আরো কিছু অংশমাত্র। প্রাকৃতিক নির্বাচন সেই জিনগুলোকেই নির্বাচিত করে যারা সজীব যন্ত্রকে তার পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির পক্ষে সবথেকে উপযোগী করে গড়ে তোলে। পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির মধ্যে অন্যান্য সজীব যন্ত্র বা জীবও অন্তর্ভুক্ত। ভিন্ন প্রজাতির জীবেরা একে অপরকে প্রভাবিত করে - খাদ্য-খাদক সম্পর্ক ছাড়াও পরাগরেণু বাহক প্রজাপতির মত উদাহরণও কম নেই। তবে একই প্রজাতির জীবেদের পারস্পরিক প্রভাব তুলনায় বেশী। কোনো এক জীবের কাছে বাকি সব জীব খাদ্যশৃঙ্খলে তার প্রতিযোগী আবার অর্ধেক (সাধারণভাবে) জীব তার সম্ভাব্য প্রজনন-সঙ্গী, বাকি অর্ধেকের সাথে প্রতিযোগিতা করেই তবে সে বংশবিস্তারে সক্ষম হবে। সাধারণ বিচারে, তাই জীবের পক্ষে তার প্রতিযোগীকে হত্যা করাটা (এবং খেয়ে ফেলাটা) খুবই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। বাস্তবে কিন্তু তার উল্টোটাই বেশী করে চোখে পড়ে। শুধু তাই নয়, কনরাড লোরাঞ্জের 'অন অ্যাগ্রেসন' বই-এর মতে, নিজেদের মধ্যে এই মারামারিও জীবজগতে বিভিন্নভাবে হয়, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার ফলে পরাজিত পক্ষের প্রাণসংশয় হয় না। উন্নততর জীবজগতে, বিশেষত মানুষের মধ্যে আবার আগ্রাসনের পরিবর্তে পারস্পরিক সহযোগিতাই বেশী করে চোখে পড়ে। জীবজগতে হানাহানির পরিবর্তে এরকম সহযোগিতা কেন দেখা যায় যদি স্বার্থপর জিন-বিস্তার করাই জীবের লক্ষ্য হয়ে থাকে?

উত্তরটা প্রথমে একটা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাক। ধরা যাক মুক্তমনায় অপার্থিব আর বন্যা আমার প্রতিযোগী দুই সদস্য। এটা ভাবা খুবই স্বাভাবিক যে আমি এখন অপার্থিবের মুখোমুখী হলেই তাকে মেরে ফেলতে উদ্যত হব। কিন্তু, এমন যদি হয় যে অপার্থিব আবার বন্যারও প্রতিযোগী, তাহলে অপার্থিবকে মারলে আদপে বন্যার সুবিধাই হয়ে যাবে। বরং, বন্যা আর অপার্থিবের মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্র হলেই আমার লাভ

** স্বার্থপর জিন কথাটা রিচার্ড ডকিন্স প্রদত্ত The Selfish Gene এর বাংলা অনুবাদ। জীবের আচরণ কিভাবে বিবর্তনের পথে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে স্বার্থপর জিন দিয়ে - সে বিষয়েই বইটা। এই লেখাটা মূলত বইয়ের পঞ্চম অধ্যায় থেকে নেওয়া। ...*

বেশী। তাই, প্রতিযোগিতার জটিল ঘূর্ণাবর্তে প্রতিযোগীদের নির্বিচারে হত্যা করাটা নির্বাচিত হবার জন্য খুব একটা ভাল কৌশল নাও হতে পারে। চাষের ক্ষেতে অনেকসময়েই একটি কীটনাশক ব্যবহার করে কোনো একটি ক্ষতিকর কীট ধ্বংস করে তার প্রতিযোগী আরো ক্ষতিকর কীটের সুবিধা করে দেবার ঘটনা ঘটে - যার ফলাফল ক্ষতিকর। উদাহরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে, প্রতিযোগিতা বা লড়াইতে নামার আগে বা রণকৌশল নির্ধারণে সব সজীব যন্ত্রেরই সচেতন বা অবচেতন ভাবে লাভ-ক্ষতির হিসাব করতে হবে। আর এখানেই আসে হ্যামিলটনের "বিবর্তনগত স্থিতিশীল কৌশল"।

"বিবর্তনগত স্থিতিশীল কৌশল" হল এমন একটি কৌশল বা নীতি, যেকোনো জীবগোষ্ঠীর অধিকাংশ জীব তা অবলম্বন করলে অন্য কোনো কৌশল এসে তার স্থান দখল করতে পারবে না। পরিবর্তিত পরিবেশে কৌশল পরিবর্তন হতে পারে, প্রতি জীবের নিজে নির্বাচিত হবার কৌশল একই জীবগোষ্ঠীর অধিকাংশ জীবের কৌশলের ওপর সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। মূল কথা হল, একবার জীবগোষ্ঠীর অধিকাংশ জীব এই কৌশল অবলম্বন করা শুরু করলে এর বিরোধীদের প্রাকৃতিক নির্বাচনের সরাসরি বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হবে।

মেনার্ড স্মিথের কাল্পনিক উদাহরণ দিয়েই ব্যাখ্যা করা যাক। ধরা যাক, একটি জীবগোষ্ঠীর মধ্যে দুধরণের কৌশল অবলম্বনকারী জীব দেখা যায়। প্রথমটি আগ্রাসী নীতি, আরেকটি বিবাদ নীতি। আগ্রাসীরা সবসময় শেষ রক্তবিন্দু অবধি লড়াই করে, মৃতপ্রায় না হলে রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে না। বিবাদীরা মারামারি না করে অন্য উপায়ে লড়াই করে, ঝগড়া করে, রক্তচক্ষু দেখায়, আক্রমণের ভাব করে কিন্তু রক্তপাত করেনা। এদের পার্থক্যটা অনেকটা অনেকটা ডিপ্লোম্যাট আর আর্মির পার্থক্যের মত। আগ্রাসীর সাথে বিবাদীর লড়াই হয়না, বিবাদী পালিয়ে যায়। কিন্তু দুই আগ্রাসীর লড়াইতে সর্বদা কোনো না কোনো একজন মারা যায় (বা গুরুতর আহত হয়)। প্রথমে, হিসাবের সুবিধার্থে ধরে নেওয়া যাক, কোনো জীবই জীবদ্দশায় তার কৌশল বদলায় না, এবং প্রতিযোগিতার শুরুতে একে অন্যের কৌশল জানে না। আমাদের এই মডেলের কাল্পনিক পয়েন্ট সিস্টেমে ধরা যাক, প্রতিযোগিতায় জিতলে ৫০ পয়েণ্ট, হারলে ০, সময় নষ্টের জন্য -১০, গুরুতর আহত হলে -১০০ পয়েন্ট - জিনের নির্বাচনের সম্ভাবনার সাথে মিল রেখেই এরকম পয়েন্ট সিস্টেম। এখানে মনে রাখতে হবে যে, আমরা লড়াইতে কে জিতবে তা নিয়ে আগ্রহী নই, তা নিয়ে আগেই আলোচনা হয়েছে। আমরা হিসাব করতে চাই যে এদের মধ্যে কোন কৌশলটি (বা এদের কোনো মিশ্রণ) স্থিতিশীল হতে পারে।

মনে করা যাক, জীবগোষ্ঠীর সব জীবই বিবাদী নীতি অবলম্বন করছে। তাহলে প্রতিটি প্রতিযোগিতায়, একজন জেতে (+৫০), একজন হারে (০) আর দুজনেই সময় নষ্ট করে (-১০x২ = -২০)। সমষ্টিগতভাবে লাভ হয় ৩০ পয়েন্ট, প্রত্যেকের ভাগে যায় ১৫ পয়েন্ট করে। এবার ধরা যাক একটা আগ্রাসী জীব এসে হাজির হল এই গোষ্ঠীতে। সে বিবাদীদের সহজেই লড়াইতে হারিয়ে দেবে, প্রতি যুদ্ধে +৫০ পয়েণ্ট হাসিল করবে। তার ফলে আগ্রাসন নিয়ন্ত্রক জিন খুব সহজেই জীবগোষ্ঠীতে বিস্তার লাভ করবে। এবার ধরি, যথেষ্ট সময় পরে, জীবগোষ্ঠীতে সবাই আগ্রাসী হয়ে গেছে। একইভাবে হিসাব করে দেখা যায়, দুটি আগ্রাসী জীবের লড়াইতে গড়ে -২৫ পয়েণ্ট পায় (জেতায় +৫০, সময় নষ্টে -১০x২ = -২০ আর গুরুতর আহত হওয়ায় -১০০)। একটি বিবাদী সেই দলে থাকলে সে সব লড়াইতে হারে, কিন্তু গড়ে সে ০ পয়েণ্ট পায়। ২৫ পয়েন্টের সুবিধা থাকায় সহজেই বিবাদ কৌশল নিয়ন্ত্রক জিন বিস্তার লাভ করবে।

এতদূর পর্যন্ত গল্পটা শুনে মনে হতে পারে যে জীবগোষ্ঠীতে সবসময় এই দুই কৌশলের জীবেদের মধ্যে একটা বাড়াকমা চলবে। আদপে, অংক কষে দেখানো যায় যে বিবাদী আর আগ্রাসী অনুপাত ৫:৭ অনুপাতে পৌঁছলে স্থিতিশীলতা লাভ করে। মানে, ওই অনুপাতে পৌঁছনর পরে প্রতিটি আগ্রাসী আর প্রতিটি বিবাদীর গড়পরতা লাভ-ক্ষতির হিসাব মিলে যায়। নির্বাচনে আর কেউই অন্যের তুলনায় সুবিধা পায় না। যদি কোনোভাবে আগ্রাসীর সংখ্যা এর চেয়ে বেড়ে যায়, তাহলে বিবাদীরা সুবিধা পেতে থাকে, যেভাবে আগ্রাসীদের দলে একটি বিবাদী সুবিধা পেত। একইভাবে দেখানো যায়, মানবসমাজে নারী-পুরুষের স্থিতিশীল অনুপাত ১:১।

মানবসমাজে অনুরূপ নীতি দেখা যায় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে, যা গেম থিয়োরী দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। কোনো ব্যবসায়ী একই দ্রব্য কমদামে বিক্রি শুরু করলে সে সাময়িকভাবে লাভ বাড়িয়ে ফেলতে পারে, কিন্তু তার প্রতিযোগিরাও সাথে সাথেই দাম কমিয়ে প্রত্যুত্তর দিলে তার আদপে লোকসানই হবে। তাই শেষমেষ নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া ছাড়া বাজারে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে লাভ বাড়ানো সম্ভব নয়।

স্বার্থপর জিন ও স্থিতিশীল কৌশল

বিবাদী আর আগ্রাসী নীতি ছাড়াও অনেকরকম কৌশল নিয়ে আলোচনা করেছেন স্মিথ আর প্রাইস। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্রতি-আক্রমণের কৌশল। এই কৌশলে জীব প্রথমে বিবাদীর মত আচরণ করে, কিন্তু আক্রান্ত হলে প্রতি-আক্রমণও করে, বিবাদীদের মত পালিয়ে যায় না। এছাড়াও কোনো কোনো জীব শুরুতে আগ্রাসীদের মত ব্যবহার করে আক্রান্ত হলে পালিয়ে যেতে পারে - সেটাও একটা কৌশল। আর আছে শুরুতে পরীক্ষা করে যাচাই করে দেখে নেবার কৌশল। স্মিথ আর প্রাইস দেখিয়েছেন, এসবের মধ্যে প্রতি-আক্রমণের কৌশল বা টিট-ফর-ট্যাটই হল একমাত্র স্থিতিশীল কৌশল, অর্থাৎ, জীবগোষ্ঠীতে শুধু এই কৌশলই চালু থাকলে, বাকি কৌশল অবলম্বন করে জীবেরা অতিরিক্ত সুবিধা আদায় করে উঠতে পারেনা। শুরুতে পরীক্ষা করে নেবার কৌশলও প্রায় স্থিতিশীল, তবে এই কৌশল অবলম্বনকারী জীবগোষ্ঠীর মধ্যেও প্রতি-আক্রমণকারীরা সামান্য সুবিধায় থাকেন। উৎসাহী পাঠকেরা নিজেরা একই পয়েন্ট সিস্টেমে হিসাব করে দেখতে পারেন কোন ক্ষেত্রে কিভাবে কারা সুবিধাপ্রাপ্ত হয়। প্রকৃতিতে এই পয়েন্ট সিস্টেমের কিছু হেরফের হলেও মূলনীতি প্রায় একই থাকে। মেরু অঞ্চলের পাখীদের ক্ষেত্রে দিনের আলো যেটুকু সময় থাকে তা শিকার না করে নিজেদের মধ্যে মারামারি করলে সময় নষ্ট করার জন্য অনেক বেশী খেসারত দিতে হবে, তাই তাদের ক্ষেত্রে সময় নষ্ট করার পেনাল্টি -১০ এর জায়গায় -৩০ ভাবা যেতে পারে। তাই সাধারণ কিছু গাণিতিক হিসাবে সমগ্র প্রকৃতির হিসাবকে মাপতে গেলে অনেক সতর্কভাবে হিসাব করতে হবে।

এবার আসা যাক আরো একধরণের লড়াইতে - যাকে পরিভাষায় বলা যায় "পলায়নের লড়াই"(War of attrition)। এর মানে, যতক্ষণ না একজন পলায়ন করে, ততক্ষণ এই লড়াই চলে। প্রকৃতিতে এধরণের লড়াই বহুল প্রচলিত - সাধারণত খুব সহজে কাবু হয়না এরকম প্রজাতির (যেমন গণ্ডার) মধ্যে চলে। দুটো জীব একে অন্যের দিকে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গী আর তর্জন-গর্জন করতে থাকে, যতক্ষণ না একজন 'রণক্ষেত্র' থেকে পালিয়ে যায়। জেতার জন্য শুধু অপরের থেকে বেশী সময় ব্যয় করতে হয়, সময়ই একমাত্র শক্তি এই

যুদ্ধে। এটা অনেকটা দুজনের মধ্যে নিলাম, যেখানে সময় হল কারেন্সীর সমতুল্য। উদাহরণ দেখতে হলে আমার মনে হয় কোনো জঙ্গলে যাবার দরকার নেই, মানবসমাজে এই পলায়নের লড়াই সর্বত্র চলে, বিশেষত বিশ্বাসের প্রশ্নে। অরকুটে বা অনেক ফোরামে (মুক্তমনাতেও) প্রায়ই দেখা যায় দুপক্ষ নিজের নিজের মতামত একতরফা বলে চলেছে। তারা উভয়েই আলাদা আলাদা মাপকাঠি দিয়ে অপরের মত ভুল আর নিজের মত ঠিক বলে দাবী জানাচ্ছে। লড়াই চলে ততক্ষণ, যতক্ষণ না একপক্ষ ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যায় বা ভাবে এই বিষয়ে আর সময় 'নষ্ট' করা ঠিক হবে না।

ধরা যাক সবাই যদি নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নেয় যে তারা একেকটি বিষয়ে সর্বাধিক এতগুলো পোস্ট দেওয়া যাবে। সেক্ষেত্রেও কোনো চালাক ব্যক্তি নিয়ম ভেঙ্গে আরো একটা বেশী পোস্ট দিয়ে বাজিমাত করবে (বাস্তবে থাকলেও প্রকৃতির নিয়মে পোস্টের ঊর্দ্ধসীমা নেই)। তাই এই কৌশল ধোপে টিঁকবে না। আবার যে লড়াইতে হেরে যাচ্ছে, সে যদি আগে থেকেই হিসাব করে নিতে পারে যে সে হেরে যাবে, তাহলে সে ওই বিষয়ে কোনো পোস্টই করবেনা, সময়ের অপব্যবহার থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবে। সেক্ষেত্রে আবার যারা শুধু কয়েকটি পোস্ট দিয়ে বাজার 'যাচাই' করে নিতে চায় ক'জন তার সাথে থাকতে পারে, তারা সুবিধাপ্রাপ্ত হবে। কারণ তার সমমতে কয়েকটি পোস্ট আসা-মাত্রই সংখ্যালঘুরা আর বিরুদ্ধে পোস্ট দিয়ে সময় নষ্ট না করার কথা ভাববে। গল্প পড়ে আবার মনে হতে পারে যে কিছুদিন পড়ে অন্যেরা এই কৌশল ধরে ফেলবে আর তারা কয়েকটা বেশী পোস্ট অবধি ধৈর্য ধরবে। আবার আমরা ঘুরেফিরে সেই গল্পের শুরুতে হাজির। তাহলে স্থিতিশীলতা আসবে কি করে? গাণিতিক বা তার্কিকভাবে দেখানো যায় যে প্রতি ব্যক্তি তার নিজের নিজের মত করে লড়াইতে তার নিজের লাভ-ক্ষতির মূল্য যা ভাবে, সেই অনুপাতেই সময় ব্যয় করবে। অরকুটে বা ফোরামে যার বিশ্বাস দৃঢ়তর (অবশ্যবিশ্বাস দৃঢ়তর হলে তার কথাই সঠিক হবে এমন কোনো মানে নেই), সেই জেতে - কারণ তার কাছে জেতার 'মূল্য'ও বেশী। এটাই স্থিতিশীল কৌশল।

এ বিষয়ে কৌশলের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল প্রতিদ্বন্দীকে বুঝতে না দেওয়া যে সে কখন পলায়ন করতে চায়। অনেকসময়েই, ফোরাম ছেড়ে বেরিয়ে যাবার আগে একপক্ষের লেখার দৈর্ঘ্য ছোটো হতে থাকে, যুক্তির তীব্রতা কমতে থাকে - যা থেকে প্রতিদ্বন্দী বুঝে যায় যে এবার প্রতিপক্ষ হার-স্বীকার করতে চলেছে। হিসাবের থেকে সামান্য বেশী হলেও সে তখন সেই অতিরিক্ত সময় ব্যয় করে লড়াইতে জেতার জন্য। তাই প্রাকৃতিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে যাদের পলায়ন আগে থেকেই বোঝা যায়, তারা সুবিধা পায় না। শেষ অবধি যারা একইভাবে লড়াই করতে পারে, তারাই নির্বাচিত হয়, তাই এই কৌশলই স্থিতিশীল।

এখন অবধি যা আলোচনা হয়েছে সব ক্ষেত্রেই ধরে নেওয়া হয়েছে লড়াইতে উভয়পক্ষ সমান বা প্রায় সমমাপের। বাস্তব প্রকৃতিতে কিন্তু তার উল্টোটাও প্রচুর দেখা যায়। মেনার্ড আর প্রাইস এই তত্ত্ব অসম লড়াই-এর ক্ষেত্রেও সফলভাবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন সেখানেও স্থিতিশীল কৌশলে পৌঁছন সম্ভব। তাদের হিসাবমত, অসাম্য প্রধানত তিনপ্রকারের -

১) আকার বা গঠনগত (বাঘ বনাম হরিণ)
২) যুদ্ধে প্রাপ্তি অনুসারে (তৃণভূমি নিয়ে মাংসাশী প্রাণী কেন লড়াই করবে?)

৩) অবস্থান নিয়ে ('হোম গ্রাউন্ড' বনাম 'অ্যাওয়ে গ্রাউন্ড')। এর মানে হল যুযুধান দুই পক্ষের এক পক্ষ আগে থেকেই সেখানকার বাসিন্দা আর অন্যপক্ষ অনুপ্রবেশকারী।

এবার দেখা যাক তৃতীয় প্রকারের অসাম্যের (হোম আর অ্যাওয়ে) সাপেক্ষে স্থিতিশীলতা কিভাবে আসতে পারে। সাধারণ হিসাবে বোঝা যায় যে "বাসিন্দা জেতে আর অনুপ্রবেশকারী পালায়" - এরকম কৌশল স্থিতিশীল। কারণ কোনো এক জীব যদি সর্বদা আক্রমণের কৌশল অবলম্বন করে, তাহলে সে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে ভাল ফল করলেও বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে লড়াইতে জড়িয়ে পড়ে অর্ধেক লড়াইতে আহত হবার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলবে। অপরদিকে, জীবগোষ্ঠীর বাকি জীবেরা কোনো লড়াইতেই যাচ্ছেনা, কেউ না কেউ পালিয়েই যাচ্ছে। তাই তারা ওই আগ্রাসী জীবের তুলনায় সুবিধাপ্রাপ্ত হবে। একই ভাবে দেখা যেতে পারে "বাসিন্দা পালায় আর অনুপ্রবেশকারী জেতে" - এটাও একটা স্থিতিশীল কৌশল - যদিও প্রকৃতিতে এর উদাহরণ খুবই কম। কারণ, সাধারণত বাসিন্দারা নিজেদের অবস্থানগত সুবিধার কারণে সেই জায়গা সম্পর্কে বেশী ভাল ধারণা রাখে, যা তাদের লড়াইতে সাহায্য করে। স্মিথের মতে, এই দ্বিতীয়টি একরকম বিভ্রান্তিকর কৌশল। কারণ, এর ফলে, বাসিন্দ বলে আর কিছু থাকে না - যে অনুপ্রবেশ করে সেই অন্যেকে একরকম তাড়িয়ে দেয়। আর প্রথমটি প্রকৃতিতে সর্বত্র দেখা যায় - যাকে বলে আঞ্চলিক আচরণ (Territotorial behaviour)।

এই আঞ্চলিক আচরণের একটা ভাল নিদর্শন দেখা যায় নিকো টিনবার্জেন-এর পরীক্ষায়। তিনি একটি অ্যাকোরিয়ামের দুপাশে দুটো যুদ্ধবাজ মাছ ছেড়ে দিলেন। তারা দুপাশে দুটো বাসাও বানিয়ে ফেলল এবং নিজেদের বাসার প্রতিরক্ষাও করতে থাকল। এবার উনি দুটো টেস্ট-টিউবে মাছদুটোকে আলাদা করলেন। এবার তাদের পাশাপাশি আনলেই দেখা যায় তারা কাঁচের ওপারে থাকা প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে মারামারি করতে উদ্যত হচ্ছে। মজার ব্যাপার হল, যদি টেস্ট-টিউব দুটোকে যদি একজনের বাসার কাছে বসিয়ে পাশাপাশি আনা যায় তাহলে দেখা যাবে যার বাসার কাছে সে মারমুখী, আর অপরজন পালাতে ব্যস্ত। বিবর্তনের পথে "বাসিন্দা জেতে আর অনুপ্রবেশকারী পালায়" - এই স্থিতিশীল কৌশল মাছগুলো আয়ত্ত করে ফেলেছে।

কিন্তু মেক্সিকোর সামাজিক মাকড়সা আচরণে ভিন্ন। কোনো মাকড়সা নিজের জালে বসে আক্রান্ত হলে সে পাথরের অপরদিকে চলে যায় ও সেখানকার মাকড়সাটাকে উৎখাত করে। এভাবে একে অপরকে উঠিয়ে দিয়ে তার জায়গা দখল করা চলতে থাকে যতক্ষণ না কোনো এক মাকড়সা নতুন জায়গা পেয়ে যায়। এদের আচরণ দ্বিতীয় স্থিতিশীল কৌশলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে বিবর্তনের পথে "বাসিন্দা পালায় আর অনুপ্রবেশকারী জেতে" - এই স্থিতিশীল কৌশল মাকড়সারা নির্বাচনের মাধ্যমে আয়ত্ত করে ফেলেছে।

কিন্তু যদি যুযুধান প্রত্যেক পক্ষ আগের যুদ্ধের ফলাফল মনে রেখে চলে তাহলে কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায় - যুদ্ধের ফলে লোকসানও কম হয়। দেখা গেছে ঝিঁঝিঁপোকা পুরোনো লড়াইয়ের ফলাফল মনে রাখতে পারে। যে ঝিঁঝিঁপোকা আগে বেশ কয়েকটি লড়াইতে জিতেছে সে আগ্রাসী নীতিতে বিশ্বাসী হবে সেটা বলাই বাহুল্য। আর ডি আলেক্সান্ডার নামে এক বিজ্ঞানী ঝিঁঝিঁপোকার ঠিক এই বিশ্লেষণই করেছেন। প্রতিটি ঝিঁঝিঁপোকা তার সমাজে নিজের লড়াই করার ক্ষমতার হিসাব রাখে - মনে রাখে ক'জনকে সে হারাতে পারে

আর ক'জনকে সে পারেনা। এজন্যই একদল ঝিঁঝিঁপোকাকে একসাথে সমাজবদ্ধ করে রাখলে কিছুদিন পরে তার মধ্যে একটা শ্রেণীবিভেদ বা হায়ারার্কি আসতে বাধ্য। ওপরের শ্রেণীর পোকারা নিচের শ্রেণীর বিরুদ্ধে আগ্রাসী হবে আর নিচেররা সহজে পালিয়ে যাবে। এমনকি উচ্চশ্রেণীর লড়াই করার ক্ষমতার পরিবর্তন হলেও সেই ঝিঁঝিঁপোকারা সহজে পার পেয়ে যায়, কারণ মনে রাখার এই কৌশল সামগ্রিকভাবে বিবর্তনগত ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। সাধারণভাবে এর ফলে দলের মধ্যে লড়াই অনেক কমে যায়, ঝিঁঝিঁপোকার সংখ্যাবৃদ্ধিও ত্বরান্বিত হয়। এই একই শ্রেণীবিভাগের আরো প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখা যায় বাঁদর আর মুরগীদের মধ্যে।

এতো গেল একই প্রজাতির মধ্যে লড়াইয়ের কথা, দুটো আলাদা প্রজাতির মধ্যে কিভাবে বিবর্তনগত ভারসাম্য আসে? আগেই বলে রাখা ভাল, আলাদা প্রজাতির মধ্যে বিবাদের সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে অনেক কম, কারণ তাদের বেঁচে থাকার কৌশল অধিকাংশ সময়েই আলাদা। একই জায়গায় পিঁপড়ে আর সিংহ থাকলে তাদের কোনো সমস্যা নেই কারণ তারা আলাদা ধরণের খাবার খেয়ে বেঁচে থাকে। কিন্তু আবার হরিণ আর সিংহের ক্ষেত্রে ঘটনাটা অন্যরকম। সিংহ হরিণের মাংস খেতে চায় অথচ হরিণ বেঁচে থেকে বংশবিস্তার করতে চায়। এক্ষেত্রে হরিণের মাংস উভয়েরই জীবনধারণ কৌশলের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ (Common resource) - তাই তা নিয়ে বিবাদ হবেই। তাহলে সিংহ আরেকটা সিংহের (বা এমনকি বাঘের) মাংস খাবার চেষ্টা করেনা কেন? এরও কারণের মূলে আছে বিবর্তনগত ভারসাম্য। এই মাংসাশী কৌশল ভারসাম্য রক্ষায় সফল হবে না - যদি এক সিংহ আরেকটিকে আক্রমণ করে তার মাংস খাবার চেষ্টা করে। এর ফলে প্রজাতির নিজেদের মধ্যে লড়াই আর তার ফলে প্রতিটি লড়াইতে প্রজাতির সামগ্রিক ক্ষমতা হ্রাস পাবে কারণ কেউ না কেউ লড়াইতে মারা যাবেই।

প্রকৃতিতে কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া দেখা যায় যে সাধারণভাবে দুই প্রজাতির বিবাদে একপক্ষ লড়াই না করেই পালিয়ে যায় কারণ দুই প্রজাতির মধ্যে সাধারণভাবে শক্তির সাম্য থাকে না। "আকারে শক্তিশালী হলে পালিয়ে যাও আর দুর্বল হলে আক্রমণ কর" - এরকম কৌশল বিবর্তনগত স্থিতিশীল। হরিণ আর সিংহ এভাবেই জঙ্গলে সাম্য রক্ষা করে - এক পক্ষ ক্রমাগত তাড়া করায় দক্ষ হয়ে ওঠে আর আরেকপক্ষ পালাতে। কোনো হরিণ যদি হঠাৎ করে সিংহের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায় তাহলে তার সাফল্যের সম্ভাবনা নেই, তাই সেই বৈশিষ্ট্যও প্রজাতিতে দেখা যায় না।

এভাবেই জিনের স্বার্থপরতা প্রকৃতিতে ভারসাম্য বজায় রাখে। যদি কোনো জিন এই কৌশলের বিরুদ্ধে যেতে চায়, তৎক্ষণাৎ তার বিস্তার সংক্ষেপিত হয়, কারণ জিনবাহক জীব প্রকৃতিতে লড়াইতে সাফল্য পায় না। আর, যারা মেনে চলে, তারা সহজেই বংশবিস্তার করে জিনের স্বার্থপরতার জাল বুনে চলে। কিন্তু প্রজাতি এই স্বার্থপর জিনের ফাঁদে পড়াই যে স্বার্থপর হয়ে উঠবে তেমন কিন্তু নয়, প্রজাতি বরং নিজের জিন বিস্তারের উদ্দেশ্যে আপাতদৃষ্টিতে হয়ে উঠবে আরো সমাজবদ্ধ আর সহমর্মি। তাই যোগ্যতমের জয়ের কৌশল নিজেদের মধ্যে হানাহানি নয়, তা লুকিয়ে আছে নিজেদের সহযোগিতার মধ্যেই।

স্বার্থপর জিন ও আত্মত্যাগ

শুধুমাত্র আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে থাকিলেই বিবর্তনে সুবিধা পাওয়া যায় - এটি যে ভ্রান্ত ধারণা তা আগের অংশে পরিস্কার করেছি। আগ্রাসী জীবেদের নিজেদের মধ্যে মারামারি করার প্রবণতা তাদের বিবর্তনগত ভারসাম্যে পৌঁছতে বাধা দেয়, যার ফলে সেই "আগ্রাসী জিন" স্থায়ী হতে পারে না। এবারে লিখছি দলবদ্ধ জীবদের নিয়ে। প্রকৃতিতে এইরকম দলবদ্ধ জীবের সংখ্যাই বেশী। পাখিরা জোট বেঁধে ওড়ে, মাছ দলে দলে সাঁতার কাটে, পোকামাকড় দলবেঁধে বাসা বানায় বা হায়েনারা দল বেঁধে শিকার করে। এখানে আলোচ্য মূল প্রশ্ন হল - এই দলবদ্ধ থাকার সহজাত প্রবণতা কিভাবে স্বার্থপর জিন তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে? প্রতিটি জীব স্বার্থপর হলে কি তাদের দল গঠিত হতে পারে না? আরো বড় কথা সেই দল বা পরিবারের জন্য সহজাত আত্মত্যাগের কি ব্যাখ্যা হতে পারে? আর একই তত্ত্ব দিয়ে জীব কিভাবে উপকারীর উপকার করতে শেখে তা নিয়েও আলোচনা করছি।

প্রথমেই নজর দেওয়া যায় দলবদ্ধ ভাবে থাকার স্বাভাবিক কিছু সুবিধার দিকে। একসাথে শিকার করায় হায়েনাদের শিকার পাবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। পেঙ্গুইনেরা নিজেদের মধ্যে জড়াজড়ি করে হাঁটে, যাতে এদের ঠান্ডা কম লাগে। একসাথে সাঁতার কাটলে সামনের মাছের তৈরী প্রবাহের মধ্যে শরীর ভাসিয়ে সাঁতার কাটাও সহজ হয়। আর V-আকৃতির জোট করে পাখিরা দূর-দূরান্তে পাড়ি দেয় একই প্রবাহ-জনিত সুবিধার কারণে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে হ্যামিল্টনের স্বার্থপর জোটের মডেলে কথা। ভুল বোঝার অবকাশ না রাখার জন্য বলে রাখা ভাল, এখানে স্বার্থপর জোট বলতে স্বার্থপর জীবের জোট বোঝানো হচ্ছে।

ডিসকভারি বা ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলে আমরা অনেকবারই দেখেছি বাঘের হরিণ শিকার করার দৃশ্য। মোটামুটি একটা সংক্ষিপ্ত জায়গার মধ্যে হরিণ দলবেঁধে চরে বেড়ায়। বাঘ যখন আক্রমণ করে, কাছাকাছি একটা হরিণকে বেছে নিয়ে তাড়া করে ধরে ফেলে। খুব স্বাভাবিকভাবেই বাঘের নজর থাকে দলের প্রান্তবর্তী হরিণগুলোর দিকে, যাদের ধরতে পারলে বাঘের শক্তিক্ষয় কম হবে। আর একই কারণে, হরিণদের দল গঠনের সময়ে সব হরিণই চাইবে যত পারা যায় দলে মাঝখানে থাকতে যাতে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা কমে যায়। ঘাস খাবার সময়ে হয়ত কিছুটা বিচ্ছিন্ন হবার দরকার পড়ে, কারণ মাঝের অংশে ঘাস দ্রুত কমে যায়। কিন্তু সাধারণভাবে চলাচল করার সময় হরিণেরা (ভাল দেখা যায় ভেড়াদের মধ্যে) যথাসম্ভব গা ঘেঁষাঘেঁষি করে চলতে থাকে। দূর থেকে দেখে এরা দলবদ্ধ বলে মনে হলেও এর পেছনে আছে প্রত্যেকের নিজ-নিজ স্বার্থপর উদ্দেশ্য - বিপদ-এলাকা কম করা আর প্রান্ত ছেড়ে মাঝের দিকে আসার প্রবণতা। এই ধরণের জোটকেই বলা যায় স্বার্থপর জোট - যেখানে সবাই নিজের স্বার্থের জন্যই জোট বেঁধে থাকে।

তবে, প্রকৃতিতে জোট-গঠন ছাড়াও সহমর্মিতার আরো অনেক উদাহরণ আছে যা এই মডেল দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। সবথেকে বড় সমস্যা হয় যেখানে জীব নিজের বিপদ এনেও দলকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। আপাতত সেরকম কয়েকটা উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। ছোটো অনেক পাখি আছে যারা বাজ বা ঈগলের মত শিকারী পাখি দেখলেই কিচিরমিচির শব্দ করে দলের বাকি পাখিদের সতর্ক করে দেয়। এর ফলে ওই পাখিটার বিপদ কিছুটা বেড়ে যায়, কারণ শিকারী তাকে সহজেই খুঁজে পেতে পারে। সে কিন্তু ইচ্ছা করলেই বিপদ বুঝে সটকে পড়তে পারে, কিন্তু সে তা না করে নিজেকে শিকারীর নিশানায় এনেও দলকে সাহায্য করছে - এই আত্মত্যাগের ব্যাখ্যা কি হতে পারে? এই ঘটনার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আগে একটা ব্যাপার বলে রাখা ভাল। পাখিদের এই এল্যার্ম কল নিয়ে বিশদ গবেষণা করে শব্দবিজ্ঞানী মার্লার দেখিয়েছেন এই ডাকগুলো এমনভাবে ডাকা হয় যাতে শিকারীরা কিছুতেই ডাক কোথা থেকে আসছে বুঝতে না পারে। স্বাভাবিকভাবে, কোনো এক সময়ে এই এল্যার্ম কল ঠিকঠাক না আসায় অনেক পাখি শিকার হয়েছে। তাই যাদের এল্যার্ম কল ঠিকঠাক, তারা বেঁচে থেকে বেশী বংশবৃদ্ধি করেছে। এল্যার্ম কল দেওয়ায় সুপটু করে তোলার জিনও প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে স্বার্থপরের মত পাখিদের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে।

এবার আসা যাক আত্মত্যাগের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে। সাধারণভাবে দেখা যায় যে একই গোষ্ঠীতে জীবের "কিন" বা আত্মীয় থাকার সম্ভাবনা বেশী। আর আত্মীয়দের মধ্যে একই ধরনের জিন থাকার সম্ভাবনাও বেশী। তাই "কিন সিলেকশন" তত্ত্ব অনুসারে জীব নিজের স্বার্থপর জিনের "কপি" বাঁচানোর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। দুটো ভিন্ন প্রেক্ষাপটে দেখা যাক এল্যার্ম কলের গুরুত্ব।

একধরনের পাখি আছে যারা মাটিতে চরে বেড়ায়। শিকারী আক্রমণ করলে তাদের আত্মরক্ষার সহজ উপায় হল আশেপাশের ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে পড়া। ধরা যাক এরকমই একটি পাখির দলে একটি পাখি এক শিকারীকে আগেভাগে দেখে ফেলেছে। যেকোন মুহূর্তে এরপরে শিকারী আঘাত হানবে। এখন তার কাছে দুটো পথ খোলা আছে - প্রথমটি হল নিজের মত চুপচাপ ঝোপে লুকিয়ে পড়া, আরেকটা হল সবাইকে সতর্ক করে দেওয়া। এখানে ভেবে দেখলে বোঝা যায়, পাখিটা যদি একা একা ঝোপে লুকিয়েও পড়ে, শিকারী আক্রমণ করলে গোটা দলই বিপদে পড়বে। শিকারী যদি দলবেঁধে আসে, তাহলে তো কথাই নেই। অন্যদিকে, শিকারী আঘাত হানার আগেই যদি সবাই মিলে লুকিয়ে পড়া যায়, তাহলেই বেঁচে যাওয়া যাবে। এধরনের পাখিরা তাই হিস-হিস শব্দে বাকিদের সতর্ক করে দেয়।

আরেক ধরনের পাখির কথা আসে, যারা আক্রান্ত হলে দলবেঁধে উড়ে পালিয়ে যায়। আগেরবারের মতই ভাবা যাক যে কোনো এক শ্যেনদৃষ্টি পাখি শিকারীকে আগে থেকেই দেখে ফেলেছে। এখন সে একা উড়ে যেতে পারে। কিন্তু শ্বাপদসংকুল পৃথিবীতে একা উড়ে গেলে তার বিপদের সম্ভাবনা বেড়ে যাওয়া ছাড়া কমে না। শিকারী পাখিরা সাধারণত এরকম একা-হয়ে-যাওয়া পাখিদেরই আক্রমণ করে সহজ শিকার বানিয়ে ফেলে।

পড়ে যদি তার আবার দলে ফিরে আসার সম্ভাবনাও থাকে তাও সাময়িকভাবে তাকে একা হয়ে যেতে হবে। তাই এই অবস্থানে সবথেকে ভাল নীতি হল নিজেও উড়ে পালানো, আর সাথে আর সবাই যাতে পালায় সেজন্য কিচিরমিচির শব্দে তাদেরও সতর্ক করে তোলা। হ্যামিলটনের এই তত্ত্ব ঠিক হোক বা না হোক, পাখিদের মধ্যে এই আচরণ বারে বারে একই রকম ভাবে দেখা যায়।

বেঁচে থাকার পথে এই কৌশল খুবই দক্ষ। এই এল্যার্ম কল নিখুঁত না হবার কারণে যেমন অনেক পাখি শিকারে পরিণত হয়েছে, তেমনই এল্যার্ম কল না দেওয়ার কারণে অনেক দলও বিপদগ্রস্ত হয়েছে। সবে মিলে এল্যার্ম কল যারা ঠিকঠাক দিতে পেরেছে, সময়ের সাথে সাথে তাদের স্বার্থপর জিন বেশী হারে ছড়িয়ে পড়েছে। জীব নিজে স্বার্থপরের মত এল্যার্ম কল দিতে শিখেছে আর তা দেখে আমরা তাদের আত্মত্যাগের কথা ভেবে বিমোহিত হয়েছি।

ঘনিষ্ঠতা ও স্বার্থপর জিন

আরো জটিল কিছু উদাহরণের মাঝে ডুব দেওয়ার আগে চট করে একটা তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা সেরে ফেলা যাক। জিন তো হল জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রক - একেকটি জিন একএকভাবে জীবের প্রকৃতি ও আচরণে প্রভাব আনে। কিন্তু, এই যে লেখার শিরোনামে "স্বার্থপর জিন" বলে একটা খটমটে তত্ত্বের নাম দেখা যাচ্ছে, সেটার মানে কি? সহজ করে বললে, যে জিন জীবগোষ্ঠীর মধ্যে নিজের উপস্থিতি বাড়িয়ে তুলতে সর্বদা সচেষ্ট, তাকেই বলা যায় "স্বার্থপর জিন"। রিচার্ড ডকিন্সের তত্ত্ব অনুসারে, যে জিন যত "স্বার্থপর" হবে - মানে নিজের উপস্থিতি বৃদ্ধিতে যত সচেষ্ট হবে, সেই জিনই জীবজগতে বেশী করে স্থান করে নেবে। কিন্তু জিনের তো নিজস্ব কোনো সচেতনতা নেই, তাহলে সে কিভাবে স্বার্থপর হতে পারে? সমাধানটাও সহজ। যে জিনের প্রভাবে জীব নিজের জিন বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হবে, সেই জিনই নির্বাচিত হবে - যেন, জিন চালকের আসনে বসে জীবকে নিয়ন্ত্রণ করে এমনভাবে চালাচ্ছে, যাতে সে জিনের আরো "কপি" তৈরীতে সাহায্য করে - নিজের "স্বার্থে" জীবকে চালনা করছে। "কপি" করার এক পদ্ধতি তো প্রজনন, কিন্তু আরো এক ভাবে জিনের স্বার্থপরতা প্রকাশ পায়। অন্য যে জীবের শরীরে একই জিন উপস্থিত আছে, জীবকে তার প্রতি পক্ষপাতিত্বে প্রলুব্ধ করে। কিন্তু কিভাবে জানা সম্ভব কার দেহে কিসের জিন আছে? প্রকৃতিতে একটাই উপায় আছে এটা অনুমান করার - আত্মীয়তা। একদল নিকটাত্মীয়কে বাঁচানোর জন্য যদি কোনো জীব প্রাণ বিসর্জন দেয়, তাহলে তা হবে কোনো এক এরকম "স্বার্থপর জিন"-এর "প্ররোচনা" বা প্রভাবে - কারণ জীব নিজে মরে গেলেও তার জিনের "কপি" কিন্তু তার নিকটাত্মীয়দের দেহে সুরক্ষিত থাকার সম্ভাবনা খুবই বেশী। বিবর্তনের দৃষ্টিতে দেখলে, যে জিন জীবকে নিকটাত্মীয়দের সাথে ঘনিষ্ঠ করে তোলে বা তাকে নিকটাত্মীয়দের জন্য প্রাণ অবধি দিতে প্ররোচিত করে, সেই জিনের নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা বেশী - কারণ, জীবগোষ্ঠীতে এই জিনের "কপি" বেড়েই চলবে। ক্রমে, জীবের বৈশিষ্ট্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে এই ঘনিষ্ঠতা - জীবজগতে এর ব্যতিক্রম মেলা দুস্কর। এই একই কারণে জীবের বাবা-মায়ের পক্ষপাতিত্ব পেয়ে বড় হয়। বিজ্ঞানী ফিশার,

হ্যালডেন আর সর্বোপরি হ্যামিল্টনের প্রতিষ্ঠিত এই তত্ত্বই জনসমক্ষে এনেছেন রিচার্ড ডকিন্স তার "সেলফিশ জিন" বইতে।

হ্যামিল্টন আরো এক ধাপ এগিয়ে গাণিতিকভাবে হিসাব করার চেষ্টা করেছেন ঠিক কতটা নিকট আত্মীয় হলে তার জন্য জীব প্রাণ দিতেও প্রস্তুত থাকে। তার বক্তব্য হল - এক জীব অপর এক জীবের সাথে যতটা জিন শেয়ার করে, ততটাই তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা। কিন্তু বাস্তবে কেউ জানে না কে কতটা জিন শেয়ার করে, তাই জীব শেয়ার করার সম্ভাবনার ওপর দিয়ে "হিসাব" করে। এই হিসাব মত, সন্তান বাবা-মায়ের ৫০% জিন শেয়ার করার সম্ভাবনা রাখে, তাই সন্তানের সাথে ঘনিষ্ঠতা ৫০% বলা যায়। একই ভাবে সন্তানদের নিজেদের মধ্যে জিন শেয়ার করার সম্ভাবনাও ৫০% - তাই তাদের মধ্যেও ঘনিষ্ঠতা সমান। কিন্তু তুতো ভাই-বোনেদের সাথে জিন শেয়ার করার সম্ভাবনা ১২.৫%, তাই এদের ঘনিষ্ঠতাও তুলনায় কম । এই ঘনিষ্ঠতার কারণটা খুবই সহজাত। স্বার্থপর জিন জীবকে বিবর্তনে এমন পথে নিয়ে চলে যাতে তার জিন-বিস্তারে সে উদ্যোগী হয়। যার সাথে সে বেশী জিন শেয়ার করবে, তার জিন-বিস্তার একরকম তার নিজের জিন-বিস্তারের সমতুল্য - যত ঘনিষ্ঠতা বাড়বে, তত বাড়বে নিজের জিন বিস্তারের সম্ভাবনা। এখন এ থেকে সহজেই অনুমেয় কিভাবে জীব তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হয় - নিজে মরে গেলেও তার জিন-বিস্তারের সম্ভাবনা মরে না। তাই এই পরোপকারী জিন বিস্তৃত হয় - জীবসমাজে স্থান করে নেয়।

এবার অনেকেই প্রশ্ন করবেন কেন অপত্যের তুলনায় বাবা-মায়ের আত্মবিসর্জন দেবার প্রবণতা বেশী দেখা যায় জীবজগতে? কারণ ব্যাখ্যা করা যায় অন্য দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। অপত্য জীবের বয়স কম বলে তার জিন সঞ্চারের সম্ভাবনাও বেশী বাবা-মায়ের তুলনায়। তাই অপত্যস্নেহের জিন ভারসাম্য রেখে জীবসমাজে স্থান পেয়ে গেছে। উদাহরণ হিসাবে ধরা যায় যে মনে করা যাক এক বাবার মধ্যে এই অপত্য-স্নেহের জিন আছে। তার চার বাচ্চাকে বাঁচাতে গিয়ে সে মারা গেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই অপত্য-স্নেহের জিন তাদের বংশবিস্তারের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে, আর বাড়িয়ে তোলে জিনপুলে নিজের অস্তিত্ব। তাই এই অপত্য-স্নেহের জিন আসলে একটি স্বার্থপর জিন - জিনপুলে নিজের সংখ্যা বাড়াতে সদা-"সচেতন"। অন্যদিকে, স্বার্থপর জিন মোটেও জীবকে স্বার্থপর করে তোলে না, বরং ঘনিষ্ঠদের ক্ষেত্রে পরোপকারী করে তোলে।

দিগন্ত সরকার, পেশায় কম্পিউটার প্রকৌশলী, মূল আগ্রহ বিজ্ঞান-সংক্রান্ত লেখায়। অর্থনীতি, রাজনীতি বা অন্যান্য বিষয়েও লিখে থাকেন। মুক্তমনার নিবেদিতপ্রাণ সদস্য। বর্তমান নিবাস সিয়াটেল, আমেরিকা। ইমেইল - diganta.sarkar@gmail.com